উদ্দেশ্য

আয়ুর্বেদ চিকিৎসা-শাস্ত্র মধ্যে, অর্থাৎ—চরক, স্নাতক ইত্যাদি এই মধ্যে যে সকল গুণযুক্ত পুরুষ চিকিৎসক হইবার উপযুক্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; আধুনিক চিকিৎসা জগতে তরুণ গুণ-সংযুক্ত চিকিৎসকের অনুসন্ধান করিলে, "ঠক আছে গী ওঝোড়" বলিয়া যাহা বুঝায় তাহাই হইতে থাকে। অতএব উপযুক্ত চিকিৎসকের অভাবে অনেক সময় চিকিৎসার ব্যাপার ঘটে, এমন কি কখন কখন চিকিৎসা করাইতে গিয়া গৃহস্থের ধন, প্রাণ উভয়ই বিপন্ন হয়। অনেকে কথাটি অতি অতিরঞ্জিত বলিয়া যেন করিতে পারেন কিন্তু অধিকাংশ লোকই এ বিষয় ভুক্তভোগী অতএব বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।

জগতে যে কয়েক প্রকার চিকিৎসা আছে তবে হেমোইপাথি সর্বাঙ্গে সমস্ত। হয়তো অনেকে: আমার এই কথাটিতে কিছুই বিদ্যমান হইতে পারে, কিন্তু আমি ইহাতে আশা করি যে, তিনি একদিন আমার এই কথার প্রতিকীম করিবেন। হেমোইপাথি সর্বাঙ্গে সমস্ত, সেই কারণ আমি হেমোইপাথিক মত এমন কতকগুলি পুষ্টি সরল বাণী। তাহার লিখিয়া সাধারণের প্রদান করিতে ইচ্ছা করিতেছি, যাহা ইহার মত কুললনারায় চিকিৎসকের সাহায্য বাংলার হেমোইপাথিক মত বিশেষ চিকিৎসা করিতে পারেন।

কৃত্রিম হন্তে মহৎ আশা। আমার হন্তে অত্যন্ত কুস্ত বেল তথাপি ইহাতে কেমন করিয়া এ মহৎ আশার বিষয় হইল যেনই বা আমি ততু উদ্যোগ ও চেষ্টা করিয়া সরল মোটরিয়া মোড়ক খুনি প্রাকাশ করিতে সত্য হইলাম। আমি কখনই ইহা খুঁষ্টি চিতা করি নাই। আমি
পূর্ব্বেও আমাদের দার্শনিক পুরুষের কার্য সম্পাদন করিবার মানসে বহু বক্ত, অর্থায়ন ও বৃদ্ধি প্রয়োগ করিতে করিতে নাই, কিন্তু আমি সফল-প্রস্ত হই নাই। আজ তদপেক্ষা আমাদের ও নির্দেশে কেমন করিয়া পুত্তকথানি প্রকাশিত হইল, তাহা আমার কুদ্র বৃদ্ধির অতীত। অতএব উদ্দেশ্য আমার নহে, উদ্দেশ্য যাহার তাহারই, তিনিই তাহা প্রদ করিবেন, আমি যথেষ্ট মাত্র।

লেবক,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।
পরিচয়

মহাত্মা হানিমান একদিন একখানি এলোপ্যাথিক মেট্রিয়া মেডিকা তরজমা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন, একোকার তাহার পুত্রকের একজন লিখিতেছেন, স্থপত শ্রীরে কুইনাইন দেওয়া করিলে তার হয় এবং অর্থে কুইনাইন দেবন করিলে আরেগা লাভ করে। বিশাল শৃঙ্খলে এই বাক্যটি মহাত্মা হানিমানের কথিত ছদ্মে হোমিওপ্যাথিক ব্রীজ-পুরূষ নিকে কিনলেন। তিনি নিজে এবং কেংকুটী সন্দীপ্তী মুখ্যাত্মক কুইনাইন সেবন করাইয়া দেখিলেন, বাংলাদেশে বুঝিয়াছেন কুইনাইন সেবন করিলে তার হয়। মহাত্মা হানিমান একজন অতি সুখদশী পুরুষ ছিলেন। তিনি পেদিলেন যে কয়েকজন সম্ভাব্যে কুইনাইন সেবন করাইয়াছিলেন, কারণ তারা ভরণের অক্সিজন উৎপাদিত হইয়াছিল। এখানে তিনি বুঝিয়াছিলেন কুইনাইন কখনই নানা প্রকার অরেগা করিতে সক্ষম হইবে না। কারণ কুইনাইন একই প্রকার অরেগা উৎপাদন করিতে সক্ষম। তাহার দ্বারা নির্ভুল কি না, পরীক্ষা করিয়া জানা, কুইনাইন সেবন করিলে যে প্রকারের অরেগা হয়, তাহার বিশেষ বিশেষ লক্ষণও লিপিবদ্ধ করিয়া। রাখিলেন এবং উক্ত লক্ষণ সংজ্ঞান অর-রোগীতে রুখ্ত মাত্রায় অর্থাৎ এলোপ্যাথিক ডাক্তারেরা যে মাত্রায় ওষধ ব্যবহার করেন, সেই মাত্রায় কুইনাইন প্রয়োগ করাতে প্রথমে রোগ অবশিষ্ট রুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পরে নির্মলু হইল। রোগ প্রথমে রুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, ক্রমে বিদ্রুত্ত হইল দেখিয়া মহাত্মা হানিমান ওষধের মাত্রা কমাইতে আরম্ভ করিলেন। ওষধের মাত্র যত কমাইতে কার্য করিলেন ততই রোগ রুদ্ধি না হইল। শীত এবং শুষ্কভাবে
আরোগ্য হইতে লাগিল। তিনি অন্যান্য ঔষধ ও উক্ত উপায়ে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরে মাত্রা কমান সময়ে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হইল। তিনি দেখিলেন কতকগুলি ঔষধ এক বিন্দু মাত্র এরোগ্য করিলেও রোগের রুদ্ধি হইয়া থাকে। ঔষধের তেজ কমাইবার জন্য ৯৯ গ্রেণ দ্রুত-শর্করা বা ৯৯ ফোটা জলের সহিত এক গ্রেণ ঔষধ উত্তম রূপে মিশাইলা, উহাকে ১ শতাংশক ডাইলিউশন নামে অভিহিত করিলেন, এবং উক্ত ঔষধ এক গ্রেণ মাত্রায় ব্যবহার করিয়াও রোগের রুদ্ধি দেখিতে পাইলেন। তখন তিনি পুনরায় ১ শতাংশক ডাইলিউশন হইতে ১ গ্রেণ অথবা ১ ফোটা ঔষধ লইয়া উহার সহিত ৯৯ গ্রেণ দ্রুত-শর্করা অথবা ৯৯ ফোটা জল উত্তমরূপে মিশাইলেন, উক্ত উপায়ে কমাইয়া দুই হইতে তিন, তিন হইতে চারি ইত্যাদি ৩০ ডাইলিউশন পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিলেন এবং ৬, ১২, ৩০ ডাইলিউশন ঔষধ সমূহ ব্যবহার করিয়া অতি সতোজনক ফল পাইতে লাগিলেন। এ স্থানে মহামায়া হামিনানা নিশ্চিত না হইয়া আরও চিন্তিত হইলেন, কারণ ৩০ ডাইলিউশন ঔষধের মধ্যে স্বাস্থ্য (ঔষধ ডাইলিউশন করিবার জন্য দ্রুত-শর্করার স্বাস্থ্য ব্যবহার করিয়াছিল, এফা অধিকাংশ ঔষধ স্বাস্থ্য দুর্বিতার দ্বারা ডাইলিউশন করা হয়।) অথবা দ্রুত-শর্করা বাতিরেকে আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি বহু চিন্তা এবং প্রমাণ দ্বারা এই ধার্য্য করিলেন, প্রতোক পদার্থে যত ডাইলিউশন করা হয়, ততই তাহার বিশ শক্তি নষ্ট হইয়া অমূল্য শক্তি বর্জিত হইতে থাকে। তখন তিনি ডাইলিউশনের 'শক্তি' (Potency) আর্য্য প্রদান করিলেন। উপরোক্ত বিশেষের এবং পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে পরিস্ফৃত বুঝিতে পারা যায়, ইহাতে মহামায়া হামিনানার নিকেতে কিছু ক্ষতি নাই, তিনি দ্বিতীয়ের নিয়মে যাহা দেখিলেন সুগতকে তাহাই দেখাইয়াছেন।
উপরোক্তিতে ঘটনাটির দ্বারা আরও এই প্রমাণ হইতেছে যে, স্নৃষ্টিরীতে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে যে সকল লক্ষণ উদিত হয়, সেই প্রকারের লক্ষণ সমুহ স্বাভাবিক ব্যাধিতে দৃষ্টি হইলে, উক্ত ঔষধ অত্যন্ত তঁহার সেবন করিলে রোগ আরোগ্য হয়। অতএব চিকিৎসা করিতে হইলে, স্নৃষ্টিরীতে কোন ঔষধ প্রয়োগ করিলে কি কি লক্ষণ উৎপাদিত হয়; তাহা বিশেষরূপে জানাই আবশ্যক। কোন ঔষধে কি কি লক্ষণ উৎপাদিত হয়, মেডিকীয়া মেডিকিয়া নামক পুস্তক মধ্যে তাহাই বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতএব মেডিকীয়া মেডিকিয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-দিগের প্রধান অবলম্বন। একেবারে হোমিওপ্যাথিক জগতে তিন শ্রেণীর মেডিকীয়া মেডিকিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমে মহারা হামিনামান এক প্রাণালীতে মেডিকীয়া মেডিকিয়া লিখিয়াছিলেন, পরে মাননীয় কেরিং ইত্যাদি ডাক্তারেরা মহারা হামিনামানের পত্র পরিপ্রেক্ষা করিতে মেডিকীয়া মেডিকিয়া আরও সহজ করিবার মানসে অন্য পথ অবলম্বন করিলেন এবং একেবারে পেন্ট, ফেরিংটন, ন্যাপ ইত্যাদি ডাক্তারদের ইহ। অপেক্ষাকৃত আরও সহজ বোধগম্য করিয়াছেন।

মহারা হামিনামানের প্রাণালীতে মেডিকীয়া মেডিকিয়া লিখিয়াছিলেন উহা সাধারণের বোধগম্য নহে, চিকিৎসাচিত্র ব্যতিরেখা সাধারণে সহজে উহার ভাব গ্রহণে সমর্থ হয় না। মহারা হামিনামান তাহার মেডিকীয়া মেডিকার মধ্যে বাক্যগুলি তুলিয়ায় প্রত্যেক ঔষধের চিত্র অতি নিপুণতার সহিত আকার রাখিয়াছিলেন, দিব্যচক্র দেখিলে সে চিত্র দর্শন একে-বারেই সমস্তপর নহে। হামিনামানের অব্যবহিত পরেই যে মেডিকীয়া মেডিকিয়া গুলি বাহিয়া হইয়াছে উহারা সরল ও বোধগম্য হইলেও স্নৃষ্টি ও গভীর জ্ঞান দানে সমর্থ নহে। যদিও আমার মেডিকীয়া মেডিকীয়া থাকি শেষের প্রাণালীতে লিখিত তথাচ আমি এ সমূহে কিছু বলিব। সুতরাং বলিয়াছি ইহা আধুনিক, যেমন আধুনিক ধর্মোপলত একবারেই বলিয়া।
দেয় ঈশ্বর নিয়ন্ত্রক, যদি চইহা পূর্ণ জ্ঞানের চরম কথা এবং ইহার পর আর কথা নাই, তথাপি বিশ্বাসের সম্ভিত ইহাকে অবস্থান করিলে কালে মনোরথ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ বুকের গোড়া ধরিলে ডাকায় আসা এবং যদাপি কেহ ডাকা ধরিয়া দেয় তাহা হইলে যদিচ প্রথমে উঠিতে বড়ই কষ্ট হয় কিন্তু একবার উঠিতে পারিলে, অতি সহজে গোড়া আসা যায়। আধুনিক মেটরিয়া মেডিকা গৃহী হোমিওপ্যাথির পূর্ণ জ্ঞান প্রাপ্ত করিতে অক্ষম কিন্তু বিশ্বাসের সম্ভিত ইহাকে অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে সিদ্ধি লাভ নিশ্চয়ই হইয়া থাকে।

হোমিওপ্যাথিক মেটরিয়া মেডিকা মধ্যে কেবল মাত্র ঔষধের লক্ষণ গুলি লিখিত হইয়াছে। মহাত্মা হামিদ ইত্যাদি চিকিৎসকদিগের লিখিত গ্রন্থ মধ্যে ঔষধের লক্ষণসমূহ বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে। সাধারণে উক্ত একাধার্য পাঠ করিলে সহজে ঔষধের পার্থক্য নির্ণয় করিতে পারিবেন না, কারণ ঔষধগুলি পাঠ করিলে চারিটি লক্ষণ ব্যতীতেকে, সমস্ত ঔষধের লক্ষণগুলিই এক প্রকার বিলিয়া মনে হইবে। কিন্তু একক্ষণ তাহা নহে, যেমন একক্ষণে অবশ্যই চারিটি সমুদ্র নিরীক্ষণ করিলে, যদিও প্রতাপেরই শরীরের চক্ষু কর্ষণ নাঞ্জক। ইত্যাদি সমূহের অঙ্গ প্রাণ সমূহ দৃষ্ট হয়, তথাপি উহাদিগের মধ্যে বিরুদ্ধ পার্থক্য থাকে। উক্ত পার্থক্য সমূহ পুনর্বারাপে নিরীক্ষণ করিয়া লিখিত করা যত কষ্টই হউক বা না হউক, উক্ত প্রকারে লিখিত পার্থক্য পাঠ করিয়া উহাদিগের আকার জ্ঞাত করা অতীত কষ্ট। অতএব চিত্তাশীল ব্যক্তি ব্যতীতেকে উহাদিগকে পাঠ করিতে যাওয়া বিতর্কন মাত্র। আধুনিক মেটরিয়া মেডিকা লিখিবার প্রণালী উজ্জ্বল। যাহারা “ধরি মাছ না হুই পানি” করিয়া চান অর্থাৎ বাহারা অধিক চিন্তা এবং পরিশ্রম না করিয়া, কার্ত্তিকার উপরে চান, উহাদিগের পক্ষে উত্তম কিন্তু ইহাতে বিপদ আছে, যেহেতু মাছ পড়িলে হয় জলে নামিতে হইবে নচেৎ মঞ্জরের ক্ষাস।
পরিবর্ত্ত করিতে হইবে। আধুনিক গ্রন্থকারেরা কেবল মাত্র চরিত্রগত লক্ষণগুলি বিশেষৰূপে লিখিয়াছেন, ইহাতে চিকিৎসার সময় উদ্ধ নির্দেশে অধিক বেগ পাইতে হয় না, কারণ যে উদ্ধেষ্ঠ যে লক্ষণগুলি পুনঃ পুনঃ পরীক্ষিত, যে সকল লক্ষণ অবলম্বনে উদ্ধে প্রয়োগ করিয়া বহু রোগে নিষ্ঠিত ফল পাওয়া বাইতেছে এবং যে লক্ষণগুলি অত্যন্ত উদ্ধে পাওয়া যায় না, উহাদিগকে বিশেষরূপে বুকাইয়া দিয়াছেন।

আমার এই ক্ষুদ্র মেট্রিয়া মেডিকা খানি আধুনিক গ্রন্থকারের লিখিত চেষ্টা করিয়াছি। আমার চেষ্টা কতদূর সকল রহিত হইয়াছে। পাঠক মতাশেষের দিগকে বিচার্য্য।

সমগ্র মেট্রিয়া মেডিকাকার সমষ্ট ঔষধের লক্ষণগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ। চিকিৎসক যে সকল লক্ষণগুলিকে ন্যস্ত দেখিয়া বাইতে পারেন যথা, চক্ষু রক্তবর্ণ, কোন স্থানের ফুল ইত্যাদি, উহাদিগকে প্রত্যক্ষ বলা যাইতে পারে যে সকল লক্ষণ গুলিকে ন্যস্ত রোগী ভিন্ন অপরে বোধ করিতে পারে না, উহাদিগকে অনুবোধ বলা যাইতে পারে। প্রত্যেক ঔষধেই প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ উভয় শ্রেণীর লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যক্ষ এবং অনুবোধ লক্ষণগুলির মধ্যে কতকগুলি চরিত্রগত এবং কতকগুলি সাধারণ। চরিত্রগত লক্ষণ বলিতে এই বোধের হইবে, ইহা ঔষধের স্বভাবগত বিশেষ ধর্ষ এবং ইহাদিগকে অবলম্বন করিয়া ঔষধ প্রয়োগে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এক্ষণে বোধের পারা যাইতেছে, চরিত্রগত লক্ষণগুলিই সর্বপ্রধান। উহা প্রত্যেক ঔষধের মুখ্যরূপ। যেমন মুখ দর্শন না করিলে মাহুষ চেনা যায় না, তক্কার চরিত্রগত লক্ষণ ব্যতিরেকে ঔষধ চেনা অতিভে কঠিন। এই পুস্তক্রান্তির মধ্যে চরিত্রগত লক্ষণগুলি অপেক্ষাকৃত বড় অক্ষরে মুদ্রিত হইয়াছে, ইহাতে ঔষধ পাঠ করিবার সময় গোলযোগ উপস্থিত হইবে না। প্রত্যেক
ঐতে মহাশক্তি, যাহা হইতে এই জগত প্রকাশিত, উহা নিঃশ্বাস নিয়মে অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপে সমগ্র জগতে নানা প্রকার কার্য করিতেছে। অতএব আমাদিগের হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা। 
প্রণালী উচ্চ মহাশক্তির “আরোগ্যাদায়িনী মূর্তি।” আমি জানি অনেকে আমার এই কথাটি স্বীকার করিতে ইচ্ছুক করিবেন, কিন্তু একটি চিন্তা করিলে এ ভরসা স্বাভাবিক হইবে না। হোমিওপ্যাথিক ঔষধের পদার্থ নাই তবু কেন উচ্চ পদ্ধতি অবলম্বনে কাঠিন কাঠিন ব্যাধি আরোগ্য হই, তাহা হইলে নিঃশ্রেয়ঃ উহাতে কিছু আছে, কিছু আছে অর্থে উহার রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি আছে এবং হোমিওপ্যাথিক ঔষধে রোগু আরোগ্য করা যাইতে পারে, আর কোন কার্যই সম্ভব হয় না। কাজে কাজেই 
উহাকে সেই মহাশক্তির আরোগ্যাদায়িনী মূর্তি যাত্রিকে আর কি বল। যাইতে পারে?

পাঠক মহাশয়! হোমিওপ্যাথিক ঔষধ তাঙ্কিছি করিবার বস্তু নহে। আপনার এক বিন্দু ঔষধপর সহিত সেই মহাশক্তির আরোগ্যাদায়িনী মূর্তি। আপনার রোগীর শরীরে প্রতিষ্ঠা হইল। তাহাকে রোগ মুক্ত করিবে, অতএব অতি সাবধান এবং ভক্তির সহিত ঔষধ নির্বাচন করিয়া প্রয়োগ করিতে কিঞ্চিতে কৃতি করিবেন না। কারণ শক্তির অপব্যবহার করিলে তাহার ফল নিরাপদ নয়।

হোমিওপ্যাথিক ঔষধ যতই শক্তিকৃত করা হই, ঔষধে নয়ন পদার্থের 
ভাগ ততই কমিবে। যাহা এবং ইহার আরোগ্যাদায়িনী শক্তি বর্জিত হইতে 
থাকে। সেই কারণ উচ্চ শক্তির ঔষধের ক্রিয়া শরীরে বহু দিবস যাবৎ 
বর্তমান থাকে। অতএব উচ্চ শক্তির ঔষধ ব্যবহার করিলে হইলে বিশেষ 
সাবধানতা। অবলম্বন করা কর্তব্য।